খেলার ছলে কিছু কথা

মহীতোষ খাঁড়া

খেলা যদি স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগের বহিঃপ্রকাশ হয়, তবে কোন্ কোন্ অনুশীলন ও দৈহিক কসরৎ -কে খেলা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যাবে? এ প্রসঙ্গে আয়োনা ওপি ও পিটার ওপি ছোটদের দৈহিক, বৌদ্ধিক কসরৎ ও গ্রামীন খেলাধূলাকে 'খেলা' হিসাবে চিহিত করতে বিন্দুমাত্র কুন্ঠিত হন নি। তাঁরা মনে করেন, হঠাৎ-ই খেলার শু, হঠাৎ-ই খেলার শেষ, শু হলে-ই যে শেষ করতে হবে, তেমন কোনো বাঁধাধরা কথা নেই। খেলোয়াড়দের খেলার ধারণ-ধারন যে জানতে -ই হবে, এমন কোন নিয়মও নেই, হঠাৎ দলের সঙ্গে মিশে কেউ শু ই খেলার পরিবেশ গড়ে তোলা। সুন্দরবনে ক্ষেত্রে সমীক্ষাকালে বর্তমান লেখকের একটি বিশেষ দিনের অভিজ্ঞতার কথা এখানে একটু বলা দরকার।

একদিন ক্ষেত্রসমীক্ষায় বেরিয়েছি সুন্দরবনের মহবতনগর গ্রামে। গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় পথ চল্তি একটি রাস্তার উপর একটু চওড়া একটি স্থানে ছোটরা সকাল - সন্ধে জড়ো হয়। খবর পেয়ে চলেছি সেই স্থানের উদ্দেশে। দূর থেকে লক্ষ্য করলাম প্রায় শ'খানেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সেখানে জড়ো হয়েছে। তাদের বেশির ভাগ -ই চার-পাঁচ - ছ' বছরের। দু'চারজন চৌদ্দ বছরেরও রয়েছে। তাদের কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান। কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ জোলা, বাগদী, ধোপা। কেউ গ্রামের সম্পদশালী ঘরের, কেউ মাস্টারমশায়ের ছেলে, কেউ বা গরীব নিঃস্ব কৃষকের ঘরের। কেউ ভালো পোষাক পরে, কেউ বা উলঙ্গ, আবার কেউ কাদা - মাদা মাখা ছেঁড়া একটা প্যান্ট পরে। এমনকি পরিবেশ -ই খেলার। কেউ কিন্তু কোনো খেলা খেলছে না। কেউ ডিগবাজি খাচ্ছে, কেউ বসে আছে,কেউ ধূলোর মন্দির বানাচ্ছে, কেউ বা পাতা-লতা - ঘাস সংগ্রহ করে ঘাঁটছে আর ছড়াচ্ছে। কেউ অন্য একজনের গায়ে ধূলো ছুঁড়ে দিয়ে দৌড়। অন্য কেউ আর একজনের প া - দুটো ধরে টানছে মাটির উপর। কেউবা আর একজনের ঘাড়ের উপর, বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ চড়ে বসলো। কেউ উল্টে পড়লো, কেউ কাঁদলো, কেউ হাসলো, কেউ বকলো, কেউ আরো বেশি বেশি দুষ্টুমিতে মেতে উঠলো। কেউ আর একজনের তৈরি করা সাধের ধূলোর মন্দির লাথি মেরে দিলো ভেঙে। মন্দিরের কর্তা তাকে তাড়ালো, ঢিল ছুঁড়লো। হয়তো দু'চারটে অশ্রাব্য শব্দও ছুঁড়ে দিল অপরাধীকে তাক করে। এমনি করে ছোটরা তাদের খেলার অঙ্গন রচনা করে।

তিনশ বছর আগে জন লক বলেছিলেন, "শিশুরা স্বাধীন, তাদের ভেতর থেকে তারা নিজেদের উগ্রে দেয়। তারা চূড়ান্ত, অপ্রতিহত, দুর্বার। তারা যে কাজ করে, যেভাবে করে, যেভাবে তারা ভাবে, সেটা তাদের কাছে সহজভাবে আসে। তাই ত ারা যা ভালো বোঝে করে।" তিনি আরো বলেছেন, "শিশুরা তাদের সাধারণ খেলাধূলার মধ্যে নিজেদের চূড়ান্ত আনন্দ পায়, খেলার মধ্যে তারা তাদের আকাংখার চরম আস্বাদ পায়।" আবেগ অনুভূতির লাগাম টেনে ধরে শিশুর ঘর। ঘরের বাইরে শিশু তার অবদমিত আকাংখার চূড়ান্ত রূপ দেয়।

কিন্তু সত্যি কি শিশুরা খেলার মাঠে লাগাম ছাড়া? না, শিশুরা লাগাম ছাড়া অনুভূতির দাস হলেও তারা ছোট থেকে যা দেখে, যা দেখে পছন্দ করে, তাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনে তাদের খেলায়। দিন গিয়াগেট তাঁর আজীবন শিশু-চর্চায় যে উপলব্ধি করেছেন, তা মনস্তত্ত্বের জগতে চিরস্মরণীয়। পিয়াগেটের উপলব্ধিতে 'শিশু বড়দের ভাবনা - চিন্তা, আচার - ব্যবহারের অনুকরণে নিজেকে ধীরে ধীরে বড় করে তোলে,। এই সত্যটি ধরা পড়ে।

একটি শিশু জন্মাবার পর দু-হাত তুলে কেঁদে ভাসায়। বাঙালী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য শিশুর এই উদ্বেলিত হাতের মধ্যে ভ

াবীকালের প্রতিশ্রুতি প্রত্যক্ষ করেন। যাক সে কথা, মাটি থেকে উঠে বসার চেষ্টা করে। চেয়ার, টেবিল ধরে সে একটু একটু করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। একদিন সে আলুথালু পা-পা করে দাঁড়ায়, আর এক দুই তিন করে হাঁটতে চেষ্টা করে। ব্যর্থ শিশু পড়ে যায় মাটিতে। আবার উঠে বসে। দাঁড়াবার জন্য হাত বাড়ায়। তারপর সে কখন যেন দাঁড়ায়। সোজা হয়ে। কালক্রমে কেবল শিশুর বয়স বাড়ে না, বাড়ে তার দেখা শোনার চারপাশের ঘটনার জটিল ঘাত - প্রতিঘাত প্রত্যক্ষ - অপ্রত্যক্ষ। আর এসবের অনুকরণ চলে শিশুর ব্যবহারে, কাজে। চিন্তার জটিল আবর্ত তৈরি হয় শিশুর মস্তিষ্কে। সেগুলিই সে দেখে তার স্বপ্নে।

স্বপ্নে থাকে কলা, রস, সুখ আর সমৃদ্ধির অনুবৃত্ত। ঠাকুর্দা, ঠাকুমার মুখে রাক্ষস - খোক্কোসের গল্প, রাজপুত্রের গল্প, ছোটদেরকল্পনার কোন্ সুরেলা দিগন্তে পৌঁছে দেয়, সে হিসাব বড়দের থাকে না। শিশুর জানা জগৎ আর শোনা কাহিনীর মিশ্রণ ঘটে তার স্বপ্নে। কিন্তু জীবনের শুষ্ক মভূমিতে শিশুর স্বপ্নের সবুজ সিক্ত - বাসনা বড় বেমানান। তাই শিশুর ঘরের চার দেয়ালের বাইরে পালাতে সুযোগ খুঁজে বেড়ায়। এমন একটা জায়গা বেছে নেয় তারা, যেখানে সব তাজা বাসনা - কল্পনার সম্মেলন ঘটে। জীবনে জীবন মিলেমিশে একাকার। কোথায় হারিয়ে যায় ঘরের মা - বাবা - ঠাকুমার মুখ। বড়দের সাশন ভয়ের চমক থেকে অনেক দূরে ছোটদের স্বপ্নের বাসর দু দণ্ডের তরে। তারপর 'সব পাখি ঘরে ফেরে'। শিশুর উচ্ছ্বাস আর অফুরন্ত প্রাণশক্তি কিছুটা নিংড়ে নিয়ে যখন স্বল্পিল সবুজ গাছ একটু ধূসর হয়ে পড়ে, তখন ক্লান্তি তাদের ঘরে ফিরিয়ে দেয়।

বাঙালীর শিশু জন্মাবার পর 'মাদার' বলে না, বলে 'মা'। সে অপরিচিত হাসি হাসে না, হাসে বাঙালীর ঘরের অতি আদরেরসরল শিশুর হাসি। সে যা শেখে, যা সে বয়ঃসন্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ করে, তা ভিন্ন সমাজ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বা ঘটনার নিরিখে নয়। দেখেশুনে সে শেখে নিজের চার দিককার নিত্যদিনের সব কিছু থেকে। শিশুর স-ব-কি-ছু-ই খেলা। খেলাই তার প্রাথমিক পাঠ, খেলাই তার সমাজ - পরিচিতির প্রথম সিঁড়ি।

বাবা - কাকার সঙ্গে পড়সী - প্রতিবেশীর তর্ক - মামলা -- তাতে কী! সেসব তো বড়দের। তর্ক আর বিচ্ছেদের নিয়ম বড়দের গড়া। শিশুকে বারণ করলেও সে শুনবে কেন? লুকিয়ে কখন গোপনে ও - বাড়ির আর এ-বাড়ির শিশুরা খামারের কোণায়, ধানের গাদায় পিছনে নির্জন দুপুরে একসাথে খেলতে শু করে। কেমন করে, তার কারণ বড়দের লালচোখ বুঝবে কেমন করে/ মারধোর বা একান্ত নিরূপায় নাহলে শিশু এ মেলামেশা বন্ধ করে না। তাই বলছিলাম, শিশু সমাজ-মনস্ক হবেই, অথচ সমাজের অনৈতিক ও অপ্রাসঙ্গিক চর্চাকে সে বড় একটা পাত্তা দেয় না। এ এক অদ্ভুত ঘটনা প্রকৃতির। বড়দের বেলায় মুসলমান, জোলা, আর হিন্দুর পরিচয় অথচ শিশুদের বেলায় এই বাছ-বিচারের আবেদন বড় ক্ষীণ। তাই পাড়ার কোনো এক ক্রীড়াক্ষেত্রে তারা পরস্পরের হাতে হাতধরাধরি করে, একে ওকে ছুঁয়ে, পরস্পর জড়াজড়ি করে ধূলোয় গড়াগড়ি যায়, অন্যের কাঁধে চড়ে হ্যাঁচকা দেয় অথবা কার হাতেরখাবার কেড়ে নিজের মুখে পুরে দেয়।

শিশুরা খেলে। কিন্তু তাদের খেলা প্রতিযোগিতা নয়, অনুষ্ঠান। প্রতিযোগিতার খেলা তো বড়দের। মন কষাকষি, হিংসা, ভেদাভেদ -- এসব সামাজিক দায়িত্বশীল বয়স্কদের স্বার্থভেদী হার - জিৎ-এর সৃষ্টি। তাই ওপি যথার্থ-ই বলেন, "শিশুরা খেলে ফলাফলের জন্য নয়, ভেতরের তাগিদে তারা খেলে।"

শিশু যতদিন শিশু থাকে অর্থাৎ সে যতদিন পর্যন্ত সমাজের জটিল সম্পর্কগুলো না বোঝে, ততদিন শিশু সুলভ খেলা খেলে যায়। এই শিশুসুলভ খেলাগুলি কিন্তু সমাজ- নিরপেক্ষ নয়। পিয়াগেট মনে করেন, "শিশুর শৈশবে নিজস্ব ধারায় চলে সমাজ শিক্ষা ও অনুকরণ।" এ সময় শিশু সমাজের ঘটনাবলী, পশু - প্রাণীর - পাখির পারস্পরিক সম্পর্ক, সমাজের নৈতিক মাপকাঠির নিরিখে,অনুকরণ করে বা গড়ে নেয় তার খেলা। শিশু বাইরের জগতে যা দেখে, তাকে সে তার খেলায় বারংবার অভ্যাস করে। বারবার অভ্যাসের ফলে তার মনে আসে নিশ্চয়তাবোধ। এ থেকে আসে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস বা জ্ঞান।

বার্টাণ্ড রাসেল মনে করেন, "শিশুর শৈশবাবস্থায় দৈহিকভাবে সে প্রাকৃতিক, আর কল্পনায় তার পূর্ব পুষের ঐতিহ্য প্রবাহ।" রবীন্দ্রনাথও ঠিক এমনি উপলব্ধি করেন, "ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা/ সব শিশুদের অন্তরে।" উইলিয়াম ওয়ার্ডওয়ার্থও শিশুর মধ্যে পিতৃত্বকে উপলব্ধি করেন। ওয়ার্সওয়ার্থ, রবীন্দ্রনাথ ও রাসেলের মতামত সমার্থক। সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা এমনি করে চলে একপ্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে। তবে -ই সমাজের হাজার বছরের উঁচু বটগাছ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থ

াকে। অনেক ঝড়-ঝাপ্টার দস্যি আক্রমণকে সে থোড়াই কেয়ার করে।
সংস্কৃতির বস্তুতান্ত্রিকতার শিকড় সমাজের অনেক গভীরে। রবীন্দ্রনাথ, রাসেল এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ কাব্যের ও দর্শনের জগতের মানুষ। সংস্কৃতির বিষয়সম্মত ব্যাখ্যা তাঁদের ব্যাখ্যায় মেলে না। মার্কস ঠিক একইরকম ভুল করে গেলেন। সংস্কৃতির ব্যাপকতা তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি। সংস্কৃতি রাজনীতি বা অর্থনীতি নিরপেক্ষ নয় তো বটেই বরং সংস্কৃতির ধারণা রাজনীতি ও অর্থনীতির চাইতে অনেক ব্যাপক।
সাম্প্রতিক কালের হিলারী পেইজ-এর শিশু মনস্তত্ব সম্পর্কে সাহসী বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে স্মরণীয়। তিনি শিশুর জন্মাবার পর থেকে বয়ঃবৃদ্ধির সময়গুলি আলাদা আলাদা করে চিহ্নিত করেন এবং প্রতিটি স্তরে শিশুর কাজকর্ম, চিন্তা, খেলাধূলা প্রত্যক্ষ করে বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এমনকি তিনি কোনো কোনো শিশুর প্রতিদিনকার হাব-ভাব, মুহুর্মূহু সিদ্ধান্ত পরিবর্তন ও অ্যাকশন লক্ষ্যকরেছেন। পেইজ অনুকরণকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন। জন্মাবার পর থেকে শিশুর পরিবেশের পরিচিত তাঁর ব্যাখ্যার মূল উপপাদ্য। এ ব্যাপারে পেইজ সমাজতাত্ত্বিকের প্রাথমিক দায়িত্ব অনেকটা সেরে ফেলেছেন।
শিশুদের খেলার সময়, খেলার রীতি - পদ্ধতি, ফলাফল, ছোঁয়া, বাতিল ইত্যাদি সমূহ বিষয়ে সকলের সহমতভিত্তিক ঐক্য রয়েছে। তাই শিশু - গোষ্ঠীর মনস্তাত্ত্বিক সংহতি বজায় থাকে। খেলার বিষয় বস্তুতে প্রতিপাদ্য বিষয় কী, তা শিশুরা জানে না। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। কেউ কেউ কোনো কোনো খেলার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সচেতন, কেউ কেউ অজ্ঞান। কিন্তু সকল খেলোয়াড়খেলার নিয়মবিধি ও আচরণ পদ্ধতি জানে, মানে ও অনুশীলন করে। সমাজ - ব্যবস্থার বৈচিত্র্যময় অঙ্গ - প্রত্যঙ্গের প্রত্যয়ী বিন্যাসেরমধ্যে খেলাধূলার এক বিশেষ অবদান রয়েছে। সমাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রত্যয়ী বিন্যাসের উপব্যবস্থা হিসাবে খেলাধূলার অনবদ্যভূমিকা। তাই খেলাধূলা সমাজের সংহতি - ব্যঞ্জক অংশীদার। হার্বার্ট স্পেনসার মনে করতেন, "খেলা তো কেবল বিনোদন নয়, সহমতও অনুশীলন - পদ্ধতির ঐক্যমতের মননে খেলার অস্তিত্ব।"
ক্রীড়া ও সংস্কৃতির রূপ দুটি পৃথক নয়। একটি অপরটির পিঠোপিঠি। খাদ্য, পোষাক, কথা, শব্দ, কলা , ছড়া, গীতিকা, সুর, ছন্দ, বাদ্য, নৃত্য --- সবার মূলে খেলা। খেলাই আদিম। এই ঝিচরাচরে যেদিন জীবনের প্রথম পদসঞ্চার ঘটেছিল, সেদিন -শু হলপ্রাণীর স্থান থেকে স্থানান্তরে গমন, বিনিময়, আর সম্পর্ক তৈরির কৌশল অনুসন্ধান। বাদল - পোকা, ময়ূর, মৌমাছি, কোকিল, বৃক্ষ - লতা -- এদের ঋতুভিত্তিক নৃত্য - গীতও প্রসবকে কেন্দ্র করে যে খবর জানান দিত প্রকৃতির বাতাস, আলো বৃষ্টির - সেই সকলখবরের সুরকে যেন একদিন কেমন করে মানুষের গোচরে পৌঁছে দিল। মানুষ পরীক্ষা - নিরীক্ষা চালালো। একদিন সে সত্য আবিষ্কারকরলো -- ব্যাঙ ড াকলে বা বাদলা - পোকা পাখা মেলে উড়লে অথবা ময়ুরের পেখম নৃত্যের ছন্দে আসে বৃষ্টির আগমনী বার্তা; কোকিলের ড়াকে ধরিত্রী নব পত্রে - পুষ্পে - পল্লবে সবুজের আহ্বানে সাড়া দেয়। কৃতজ্ঞ মানুষ অনুকরণ করলো পাখী, গাছ প্রমুখদের--ধাত্রী মায়ের মত। কখন যেন প্রকৃতির নিয়মে মানুষের দেহে জাগলো শিহরণ। সুরতক্রীড়ার মত্ত কোকিল - কোকিলার মত্ততা তার দেহের পরতে পরতে কিসের এক মাদকতা আনলো। সে-ও প্রাণী। এই নশ্বর দেহের পূর্ণ প্রাপ্তির আকাংখায় সে অনুসন্ধান করে ফিরলো আদিম মানবীর। তাই তো দেখি কুমারসম্ভব কাহিনীর রতিবিলাপ, বৃক্ষারূঢ় কোকিল - কোকিলার সুরতক্রীড়া প্রত্যক্ষ করে অনুরণিত হয়েছে রতির হৃদয়ে পরতে পরতে। প্লেটো বলেছিলেন, "খেলাধূলার মূলে রয়েছে সহজাত প্রবৃত্তি।" তাই মানুষের যা কিছু আবেগ, যা কিছু কল্পনা, তার মূলে রয়েছে ক্রীড়া। ডাচ্ ঐতিহাসিক জোহান হুইজিঙ্গা স্পষ্টতঃই স্বীকার করেন, "খেল া সংস্কৃতির চাইতেঅনেক পুরনো ব্যাপার। সংস্কৃতির উৎস খেলা, যার জন্য প্রাণীকুল মানুষের অপেক্ষা করেনি।"
ইতিহাসের কোন এক স্মরণাতীত কালের ক্রীড়া চর্চার মূল কথা ছিল গোষ্ঠী ও পরিবেশ। ক্রীড়ার ভাব ও পরিকল্পনার মূলে ছিল পরিপার্শ্ব। সমাজের পুরো কাঠামোর সঙ্গে সেদিন ক্রীড়া সাজুয্যপূর্ণ ছিল। প্রাচীন খেলাধূলার যে সংস্কৃতি - সৃজনী ক্ষমতা ছিল, াতাকে অস্বীকার করে নৃত্য - গীত ও অন্যান্য কলা স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে কি করে? ক্রীড়া - সংস্কৃতি- ধর্ম - আচার সব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বয়লে তাইমনে করেন, "খেলা সমাজের আয়না, খেলার মধ্যে সমাজের প্রতিচ্ছবি পড়ে।" রব ার্টস ও সাটন - স্মিথও এক মতামতপোষণ করেন, "একটি খেলা বিশ্লেষণ করলে জানা যায়, সেই খেলাতে কোন্ সমাজের মূল্যবোধ ও আদর্শগুলির প্রতিফলন ঘটেছে।" তাই জাপান, মধ্য আমেরিকার মায়া উপজাতি, অষ্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার

বিভিন্ন দেশের খেলাধুলো ব্যাখ্যা করলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সংহতির পরিপূরক বৈশিষ্টগুলি নজরে পড়ে। ডোনাল্ড বল ও জন লয় খেলার মধ্যে সমাজের শৃংখলা রক্ষার উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। জে. বি. পিক - এর মতে, "খেলার মধ্যে আচ ার, জীবনধারা ও প্রতীকি বক্তব্য বর্তমান।"

আমরা কথায় কথায় আন্তর্জাতিক হয়ে উঠি, অথচ আন্তর্জাতিকতার পটভূমি জানিনা। আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার রূপ যে কে ানো একটি দেশজ সূত্র থেকে ক্রমবিকশিত হয়, সেদিকটা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। আধুনিক ক্রীড়া বলতে যে সমস্ত ক্রীড়া জাতীয় ওআন্তর্জাতিক স্তরে চর্চা হয়, সেগুলির উদ্ভবের এক ধারাবাহিক ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে। দু'একটি উদ াহরণ দেওয়া যেতে পারে।আধুনিক আন্তর্জাতিক 'চেস' বা 'দাবা' আসলে ভারতের খেলা। প্রাচীনকালে একটি 'চতুরঙ্গ' ন ামে ভারতে চর্চা হত। ক্রমে বাণিজ্যিকও পর্যটনের পথ ধরে এটি পারস্যে পৌঁছে গেল। পারস্যে এর নাম হল 'শতরঞ্জ'। প ারস্য থেকে আবার গেল আরবে। জেনে অনেকআশ্চর্য হবেন যে, এত মেধা ও ধীশক্তির প্রয়োজন হয় যে 'দাবা' খেলায়, ৰি দাবা নিয়ে যে এত প্রচার, প্রস্তুতি ও বিরাট অংকের ব্যয়ভার, সেই খেলাটি ভারতের বললে ভুল হবে। আসলে এটি একটি গ্রামীণ খেলা। বাংলাদেশের ঢাকা জাদুঘরের রক্ষিত একটি রৌপ্য - মুদ্রায় অংকিত ছক পাওয়া গেছে, সেটি অ াসলে একটি খেলার ছক। ষোলটি গুটি লাগে সেই ছকে খেলতে। আবার এই ষোল গুটি খেলা পরবর্তীকালে 'মোগল-প াঠান' নামেও অভিহিত হয়েছে। এই 'ষোল গুটি' বা 'মুঘল (মোঘল) পাঠান' বা অন্যত্র চর্চা হয়। অথচ আশ্চর্য যে, এই খেলাটিই যে আধুনিক ভাবনাযুক্ত হয়ে নবরূপ লাভ করে 'দাবা' খেলায় নামাংকিত, সে খবরটির সঙ্গে এদেশীয় লে াকজীবন পরিচিত নয়।

আরো একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ক্রিকেট নাকি পাশ্চাত্যের খেলা নয়, ভারতবর্ষের-ই জন্ম। প্রায় তিন হাজার খৃষ্টপূর্বাব্দে 'গিল্লি দণ্ড' নামে যে খেলাটি ভারতবর্ষের চর্চা হতো, সেটি নাকি পরবর্তীকালে ক্রিকেটের পূর্ববর্তী রূপ। হতেও পারে। প্রাচীন কালের এসব ঘটনা ও তার ধারাক্রম তো কেউ লিখে রাখেন নি। এসব কথা এদেশীয়রা জানেন না। পাশ্চ াত্যের পণ্ডিতরা এসব সংগ্রহ করে আমাদের জানান দিচ্ছেন।

আধুনিক খেলার চর্চার পথ বড় পিচ্ছল। উদ্ধবের সম-সাময়িক কালে এ যে রূপ-ধরণ-পদ্ধতি ছিল, বর্তমানে তা তথ াকথিতপরিশীলিত চেহারায় এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে খেলার মধ্যে বিচার আছে, নিয়ম আছে, প্রচুর দর্শক আছে, প্রচার - অর্থ - যশ সবই আছে কিন্তু সহমর্মিতা, সৃষ্টিশীলতা, সমষ্টি চিন্তার অভ্যাস নেই। দর্শক আর ক্রীড়ার দুটি সত্তা। লে াকক্রীড়ায় এমনটি ছিল না। সেখানেদর্শক আর খেলোয়াড় -- দুটি পৃথক একক নয়। দর্শক - ক্রীড়ক। খেলা আজ আর রে ামান্স নয়, প্রাণের উজ্জীবন নয়। সে আজ একট া উত্তেজনার খোরাক। যার নাম স্থায়িত্ব নেই, মাটির সঙ্গে নাড়ীর টান নেই। সে যেন ঝড়ের ঝাপটা। দু'এক প্রহরের খেলার শেষে তাই দেখি সল্টলেক বা ইডেন গার্ডেনে পড়ে থাকে কিছু ভাঙা চেড়ার, থান ইঁট আর কিছু টিয়ার গ্যাসের খালি সেল। এলেন গুট্ম্যান তাই যথার্থ-ই বলেছেন, "আমাদের ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি বিকারগ্রস্ত এ কারণে যে, আমরা সাবেকী আমলের খেলাধূলার সাংস্কৃতিকদিকগুলোর দিকে ফিরে তো তাকাই নি, বরং উপেক্ষা করেছি।'

লোকজীবনের খেলাগুলি চর্চা করলে নানাভাবে প্রত্যক্ষ উপকার হয়। লৌকিক ক্রীড়ায় যে পরিশ্রম, জাতীয় বা আন্তর্জা তিককোন ক্রীড়ায় সে পরিমাণ শ্রমের স্থান নেই। সুতরাং দেহচর্চার এক উপযুক্ত অনুশীলন ক্ষেত্র হিসাবে লৌকিক খেল াধূলোকে চিহ্নিত করা যায়। এই খেলাগুলি চর্চা করলে চরিত্র সাহস ও স্বভাবে সহিষ্ণুতা আসে। বিপক্ষের সঙ্গে ন্যায় ব্যবহারের প্রবণতা জাগে। তাছাড়া বহুর প্রয়োজনে ব্যক্তি -- স্বার্থকে সংহত করার অভ্যাস হয়। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শ ান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। লোকক্রীড়া চর্চার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা, দ্বেষ, অসদুপায়ে অপরকে বাধা দান, দৈহিক আঘাত, করা, কাউকে পঙ্গু করে দেবার ষড়যন্ত্র ইত্যাদির স্থান নেই। এ সমস্ত খেলাধূলায় কোন লিখিত বা সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম না থাকার ফলে খেলোয়াড়েরা নিজেরাই নিজেদের ঝগড়া - কাজিয়ার মীমাংসা করে নেয়। তাই লে াকক্রীড়া চর্চার মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটার সুযোগ রয়েছে।

আর একটি গুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার। গ্রাম নিরানন্দময়, একঘেয়ে সনাতনী ছন্দে লোকজীবনের স্রোত বয়ে চলে। সংসারের নিত্য - নৈমিত্তিক প্রয়োজনে মানুষকে কেবল কাজ করে যেতে হয়। অমানুষিক পরিশ্রমের মানুষ দেহ ও মনে ন্যুব্জ হয়ে পড়ে। এরই সমান্তরালভাবে গ্রামে দারিদ্রের প্রকোপ লেগেই আছে। খাদ্যের অভাবে মানুষকে নানা

ধরনের চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়। শোষণের নানা প্রক্রিয়ায় সে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা উপলব্ধি করতে চায়। কিন্তু গ্রাম এক মরা নদী। বিনোদনের কোনো আধুনিক সাজ - সরঞ্জম সেখানে পৌঁছলো না। এই ফাঁক। গ্রাম নিরানন্দময়, একঘেয়ে সনাতমী ছন্দে লোকজীবনের স্রোত বয়ে চলে। সংসারের নিত্য - নৈমিত্তিক প্রয়োজনে মানুষকে কেবল কাজ করে যেতে হয়। অমানুষিক পরিশ্রমে মানুষ দেহ ও মনে ন্যুব্জ হয়ে পড়ে। এরই সমান্তরালভাবে গ্রামে দারিদ্রের প্রকোপ লেগেই আছে। খাদ্যের অভাবে মানুষকে নানা ধরনের চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়। শোষণের নানা প্রক্রিয়ায় সে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা উপলব্ধি করতে চায়। কিন্তু গ্রাম এক মরা নদী। বিনোদনের কোনো আধুনিকসাজ - সরঞ্জম সেখানে পৌঁছলো না। এই ফাঁকটুকুতে লোকক্রীড়া জায়গা করে নিয়েছে। এ কেবল সুন্দরবনে নয়, কেবল ভারতবর্ষেওনয়, সারা পৃথিবীর সমস্ত গ্রাম - জীবনের ক্ষেত্রে এ কথা সত্য।

খেলা ছোটরা। আর বড়রা কোলে লাঠি গুঁজে জাল বুনতে বুনতে ছোটদের খেলার মাঠের কাছাকাছি হাজির নয়। বড়রা পরস্পর পরস্পরের সুখ - অসুখের সংবাদ নেন, সংসারের এটা - ওটা আলোচনা সেরে নেন, গ্রামের সমস্যা অথবা পাড়ার কোন তামাদি বিচারের কথা আলোচনা করতে করতে ছোটদের খেলার মজা দেখেন। মায়েরা ছাগল চরাতে চরাতে ছাগলের গলার দড়ি ধরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে পড়েন। পথচারী কোনো ভিন্ গাঁয়ের পথিক এইমাত্র ওপার থেকে খেয়া পার হয়ে এলেন, হাঁটতে হাঁটতে দৃষ্টি আবদ্ধল। এগিয়ে এলেন, বসেও পড়লেন। .....এ মজা কী কম! গাঙের জোয়ারের স্রোতের টানে ভেসে যাওয়া একগোছা তাজা ফুলের মতো শিশুদের একান্ত সময়, একান্ত তাদের হৃদয়ের বেগবতী আকাংকার স্ফূরণ, হঠাৎ পথিকের খেয়াল হল, ইস্ পায়ে হাঁটুভর্তি গাঙ লোনা কাদা!

দর্শকেরা খেলা দেখতে দেখতে আনন্দ আর আবেগের আতিশয্যে কখনো কখনো মাঠে নেমে পড়েন। বয়সের ফারাকটা খেয়াল থাকে না। ছোটরাও কম কিসে! তারাও লড়ে যায়। বড়বা খেলেন না, কারণ তাঁরা তো ছোটদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামেন না, নেমেছেন খেলায়। ঠিক এই পরিবেশ যদি গ্রামে না থাকতো, তাহলে চরম দারিদ্রের ছুরিতে কাটতে কাটতে গ্রামের সঙ্গে মূলস্রোতের যে সুতোটুকু এখনো কোনোও মতে টিকে আছে, সেটি কবে ছিঁড়ে যেত। গ্রামগুলি সমষ্টির সেতুবন্ধন ছিঁটেফোঁটা নুড়ি-পাথর ও যোগান দিতে পারতো না, যদি না লৌকিক চর্চা আবহমান কাল ধরে অনাদ্যন্ত ছন্দে নীরবে গ্রামে - গঞ্জে চলে আসতো।ঞ্চ

ঞ্চলোকজীবনের খেলাধূলা নিয়ে কোন প্রামান্য পুস্তক না থাকায় কোলকাতার অকাদেমী অব ফোক্‌লোরের অধিকর্তা অধ্যাপক ডঃ দুলাল চৌধুরী - একটি পুস্তক রচনা প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। আর সেই পুস্তক রচনার দায়িত্ব পালন করতে তাঁর এক অযোগ্য ছাত্র চেষ্টা করেছেন মাত্র। সেই সুযোগে মাসে মাসে বছরে-বছরে গ্রামে - গ্রামে ঘুরে যে ছেঁড়া কাগজের পাহাড় জমছিল, তার কিছুটার গতিও হল।

বইটি লেখার সময় কোন দায়সারা কাজ করতে চাইনি। দায়িত্ব নিয়ে চেষ্টা করেছি বাস্তবের সঙ্গে মেলাতে। যাঁরা পড়বেন, তাঁদের কাছে সহজবোধ্য করে তোলার জন্য অত্যন্ত সহজ ভাষায় লিখতে চেয়েছি।

বলা আর দেখা তো এক নয়। তাই যাতে পড়তে পড়তে উৎসাহী পাঠক ছবিটা চোখের সামনে পেতে পারেন, তাই বেশ কয়েকটি অনুচিত্র এঁকে দিলাম। খেলার ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্তে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়। তাদের গুত্ব অনুসারে অনুচিত্রগুলি তুলে ধরা হল। ज्ञद्रष्टব্য 'লোকসংস্কৃতি'! লোকক্রীড়া বিশেষ সংখ্যা/ ডিসেম্বর ২০০৩ৰ

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com